Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-V, Issue-I, July 2016, Page No. 37-45
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

গোপাল হালদারের মন্বন্তরের তিনপর্বঃ উপন্যাসের পটে 'ঐতিহাসিক কথাচিত্র'

অক্ষয় কোনাই
ছাত্র গবেষক, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরপ্রদেশ, ভারত

Abstract

Gopal Haldar wrote a trilogy'ponchaser poth','unoponchasi', 'teroso ponchas' which is related to Bengal famine. In this trilogy the writer gave a vivid picturesque of tumultuous social, political and economic life of the world as well as Bengal at the time between at the end of april , 1942to the mid of 1944. Because in this time many incidents were happened like Second World War, Bengal famine, oscillation in social life, quit india movement. At the time writer was an active communist worker. He has done social service in Bengal to relief divested people as a member of 'people's relief committee'. Therefore he was a witness of the devastation create by deluge and famine effect of the life of Bengal. This is the main instigation or inspiration of writer to write that trilogy.

Without distortion historical effect to draw up the gloom picture at the aforesaid time in this trilogy the writer portrays the main character Binoy who belongs to the middle class educated Bengali family. The character does not want to get involved to any political ideology, as a simple Bengali educated youth without selfness he has come into touch with general people by cosmopolitan view. This time the people who suffered from that plight effect of famine,Their full objective explanation in the view of character binoy is the main thrust of the trilogy.

Of course the character Binoy is not the real hero, but famine. This famine is the prime moving force of the character, and incidence of that trilogy. This trilogy is the existential struggle of people who suffered from the famine is the realistic deed of history. It is the best achievement of writer to write that trilogy.

গোপাল হালদারের 'মন্বন্তরের তিনপর্ব'- এ স্থান পেয়েছে 'পঞ্চাশের পথ' (অক্টোবর, ১৯৪৪), 'ঊনপঞ্চাশী' (জানুয়ারী, ১৯৪৬), 'তেরশ পঞ্চাশ' (জানুয়ারী, ১৯৪৫)। এই উপন্যাসের তিনটি পর্বই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত, আবার পৃথক দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি পর্ব স্বয়ংসম্পূর্ণও বটে। গোপাল হালদার ছিলেন সক্রিয় কম্যুনিস্ট কর্মী, 'পিপলস রিলিফ কমিটির' সদস্য রূপে মন্বন্তর পীড়িত গ্রাম বাঙলায় রিলিফের কাজে তিনি ঘুরেছেন। মন্বন্তরের কারণ এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে বহু জনসভায় তাঁর মুল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তাছাড়া সেই সময়ের যে উত্তাল ভয়াবহ অবস্থা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই সম্পর্কে তৎকালীন সময়ে অনেক প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন। তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ করা বাস্তব অভিজ্ঞতাই তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছিল 'মন্বন্তরের তিনপর্ব' রচনায়।

গোপাল হালদারের মন্বন্তর ত্রয়ীর ঘটনা কালের ব্যপ্তি হল ১৯৪২ সালের এপ্রিলের শেষ থেকে ১৯৪৪ এর এপ্রিলের মধ্যভাগ। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ, আগস্ট আন্দোলন, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সম্পর্কের টানাপড়েন, এবং সর্বোপরি পঞ্চাশের মন্বন্তরকে প্রেক্ষাপট রূপে ব্যবহার করে রচিত এটি একধরনের 'দলিল'বা 'ডকুমেন্টারি' উপন্যাস। এই গ্রন্থের ভুমিকা অংশে তিনি একে ডকুমেন্টারি নভেল বলে উল্লেখ করেছেন , লেখক অবশ্য একে 'ঐতিহাসিক উপন্যাসের দৃষ্টি'দিয়ে রচনা করেছেন-"সত্যিকারের যে কোনো ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে গেলে এই হয় সমস্যা । ঘটনাকে বিকৃত করা চলেনা।,মানুষকে অবান্তর করে তোলাও চলে না। এরূপ উপন্যাসে আসলে ঘটনাই মহানায়ক। কিন্তু তবু থাকে নায়ক নায়িকা ; হয়ত তারা আবার একাধিক , কেউ তারা ঘটনার স্রোতে ভেসে চলেছে, কেউ ঘাট ছুঁয়েছে , কেউ ঘাটের নিশানা ও পায়নি। আমার এই ধারণা যদি ভুল হয় তাহলে এই উপন্যাসের মূল ধারণাতেই ভুল রয়ে গেছে- তা মানতে হবে। "[১]

১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে সমগ্র বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের যে তাণ্ডবলীলা শুরু হয়েছিল ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তার বিস্তার , ভারত প্রত্যক্ষভাবে এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করলেও ব্রিটিশ শাসিত পরাধীন ও উপনিবেশরাষ্ট্র ভারতবর্ষ এই ভয়াবহ পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা পায়নি ।এই বিশ্বযুদ্ধের অনিবার্য ঢেউ ভারতবর্ষের বুকে তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি করেছিল, বিপর্যস্ত করেছিল সমাজজীবনকে। সেনাবাহিনীর রসদ সংগ্রহের জন্য ব্রিটিশ শাসক বহুবিধ কৌশলে শোষণ করল ভারতের মানুষকে, আর যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মন্বন্তর; যার করাল গ্রাসে নিঃশেষিত হল গ্রামের পর গ্রাম,আর যারা প্রাণের স্তিমিত স্পন্দননিয়ে জীর্ণ শরীরে নামমাত্র বেঁচে রইল তাদের আর নাকালের সীমা পরিসীমা রইলনা। কলকাতার মতো শহরে ফুটপাথে হাজির হল নিরন্ন ভুকা মানুষের দল ,ফ্যানের জন্য হাহাকার উঠল কলকাতার বুকে।একদিকে বিশ্বযুদ্ধ ও অন্যদিকে মন্বন্তর -এই দ্বিবিধ সঙ্কটের মুখোমুখি দাড়িয়ে , মানুষের বিপর্যস্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে জিনিসপত্রের আকাশ ছোঁয়া মুল্যবৃদ্ধি সাধারন মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। মন্বন্তরের সেই দুঃস্বপ্নসম দিনগুলোতে শহরের পাষাণ পথে নিরন্ন ভুখা মানুষের দল, নিরন্ন নারীর পিছনে পিছনে শরীর শিকারী পুরুষের দল, এইসব মিলেমিশে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই ঘটেছিল সুন্দরের পশ্চাদপসরণ। উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে সমকালীন ঐতিহাসিক এই বিষয়গুলিকে একজন সাংবাদিকের দৃষ্টিতে ছবির মতো করে বর্ণনামূলক ভঙ্গীতে উপস্থাপন করেছেন লেখক।

নিজস্ব অভিজ্ঞতায় 'ইতিহাসের মর্যাদা'অনেকটা অবিকৃত রেখে সাহিত্যে তার রূপায়নের জন্য তিনি বিনয়ের মতো একজন শিক্ষিত বাঙালিকে বেছে নিয়েছেন । তার দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি মন্বন্তরের কারণ , ঘটনাবলি, এবং তার হৃদয়বিদারক করুণ পরিণাম দেখাতে চেয়েছেন ।তিনি চেয়েছেন চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ যেন সত্য হয়ে উঠতে পারে। উপন্যাসের ভুমিকায় লেখক বলেছেন-"আমি খুঁজে নিয়েছি এমন লোককে যে শিক্ষিত বাংলার কোনো মতামতের স্পর্শে আসেনি - সাধারণ বাঙালি - যে পলিটিক্সও পছন্দ করে না , যে আত্মকেন্দ্রিক বা আবেগপ্রবণ নয় , শিক্ষিত শ্রেণীর হলে ও নানা কাজে ছোট বড় অন্য শ্রেণীর সম্পর্কে আসছে-এমন মানুষের চোখে কেমন ঠেকেছিল এই মন্বন্তর ? আর কি হবে এই ঘাত প্রতিঘাতে তার নিজের পরিণতি ?"[২] উপন্যাসের এই শিক্ষিত যুবক হলো বর্মা ফেরত ডাক্তার বিনয়। তবে তাকে উপন্যাসের নায়ক বলা যাবে না। কেননা সাধারণ গতানুগতিক উপন্যাসে নায়ক বলতে আমরা যা বুঝি বিনয় সেরকম নায়ক নয়, এই উপন্যাসে যদি কোন নায়ক থাকে তাহলে সে হল নিঃসন্দেহে মন্বন্তর , এই মন্বন্তরই হল উপন্যাস ত্রয়ীর চালিকা শক্তি।মন্বন্তররূপী নিয়তির অমোঘ তাড়নায় উপন্যাসের চরিত্রগুলো অবশ্যম্ভাবী পরিনতির দিকে ভেসে চলেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জাপান কর্তৃক বর্মা প্রদেশ আক্রমনের প্রেক্ষাপটে বিনয়ের বর্মা ত্যাগ করে বাঙলায় আসার বিবরনে উপন্যাসের শুরু , শেষ হয়েছে তার আত্মোপলব্ধিতে। বিনয় ও অমিতের কথপকথনের মাধ্যমে উঠে এসেছে বিনয়ের নিজের দেখা জাপান কর্তৃক রেঙ্গুনে বোমা বর্ষণেও ফিরতি পথে মানুষের লাঞ্ছনার ইতিবৃত্ত। বর্মাতেই বিনয়ের জন্মস্থান হলেও সে ভারতবর্ষকেই নিজের স্বদেশ বলে ভালবেসেছে। সোনাকান্দি বিনয়ের

নিজেদের গ্রাম, বর্মা থেকে বিতারিত হয়ে সেখেনে আশ্রয় নিয়েছে । কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল গ্রাসে শুধু বর্মাই নয়, সারা ভারতবর্ষ তথা বাংলারও তখন ভয়ভীত অবস্থা । ইংরেজ উপনিবেশের রাজধানী কোলকাতাতে জাপানী বিমান হামলার সম্ভাবনা । বিনয় বুঝেছে , গ্রামেই থাকতে হবে এখন -বাঁচতে হলে; শহর তো রেঙ্গুনের মতো মৃত্যুর ফাঁদ হবে জাপানের বোমার মুখে। কিন্তু সেখানেও বাধ সাধল সরকার, অচিরেয় তাকে সোনাপুর ছাড়তে হয়েছে, কেননা -'ফৌজ আসবে', তাই 'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গ্রাম ছাড়তে হবে'। চাঁপা ডাঙা, সোনাকান্দির ইত্যাদি গ্রামের মানুষদের অন্যত্র সরানোর জন্য সরকারী হুকুম জারি হয়েছে-'জমি ছাড়াও,নৌকা কারো'।

মানুষের বিপর্যয়ে ভগিনী হেনা প্রতি আকর্ষণ, চিত্রার সঙ্গে ঘর বাঁধার বাসনা বিনয়কে কলকাতার সুখস্বপ্নের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারেনি। 'মানুষ বাঁচুক' এই মন্ত্রে উদ্দীপিত হয়ে জাপানী বোমার ভয় তুচ্ছ করে সে বার বার ভেসে বেরিয়েছে সোনাপুর, চাঁপাডাঙা, মথুরাপুর, মেদিনীপুরের গ্রামে গ্রামে । উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ শাসক ফৌজের থাকার প্রয়োজনে সাধারণ মানুষদের গ্রাম ছাড়াও ক্ষতিপূরণ এর কথা ঘোষণা করলেও সরকারি আমলা, কর্মচারীরা তাদেরকে নানা অজুহাতে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছে। কম্যুনিস্ট কর্মী সুধা গুপ্তা ,চব্বিশ পরগণার কৃষক কর্মী কমরেড যতীন দাসের সঙ্গে বিনয় ও তাদের সঙ্গী হয়েছে। ট্রেনে যাত্রাপথে ভুক্তভোগী গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে বিনয় জেনেছে যুদ্ধে তাদের প্রতিক্রিয়া । দেশের জমিদার, পুলিস,হাকিম, দারগারাই তাদের শত্রু বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। এই যুদ্ধকে সাধারণ জনতা মনে প্রানে সমর্থন করে না। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে হিটলার সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করলে এই যুদ্ধকে কম্যুনিস্টরা অক্ষ শক্তির সঙ্গে সাধারনের 'জনযুদ্ধ' বলে আখ্যায়িত করেছে। কম্যুনিস্টদের এহেন নীতিতে ও যৌক্তিকতায় সাধারণ মানুষ আস্থা রাখতে পারে না ,তারা বিভ্রান্ত হয়েছে । তাদের কাছে তখন পরাধীনতার গ্লানি ও ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচার অনেক বেশি প্রত্যক্ষ ও সত্য। যুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেস সেদিন কম্যুনিস্টদের এই নীতিকে সমর্থন করেনি , বরং জাপানকেই তারা মিত্র বলে মনে করেছেন।

যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ শাসক কম্যুনিস্টদের বিনা বিচারে জেলে বন্দী করেছিল। কিন্তু জনযুদ্ধের নীতি সমর্থন করলে কম্যুনিস্টদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং পার্টিকে বৈধ ঘোষণা করা হয়। প্রমথ চৌধুরী ও অনান্য কম্যুনিস্টরা মুক্তি পেয়েছে । "কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ওদের কাজে লাগাবার জন্যই গভর্নমেন্ট ওদের উপর দাক্ষিণ্য দেখিয়েছে, বিনয়েরও তাই বিশ্বাস"[৩] বিনয়ের এই বিশ্বাস নেহাতই অমূলক ছিল না। 'হরিজন'-এ উদ্ধৃত গান্ধীজীর লেখা থেকে বিনয় বুঝেছে, দেশ জুড়ে বিক্ষোভের আবহাওয়া, ক্ষোভ এবার বিদ্রোহের রূপ নিচ্ছে। ঠিক এই সময়েই বিনয় কম্যুনিস্টদের আইনি স্বীকৃতির খবর শুনেছে,এই সংবাদে বিনয় আশ্বস্ত হতে পারেনি।

যুদ্ধের সময়ে বিদেশী কোম্পানিগুলিতে শ্রমিক ধর্মঘটকে কেন্দ্রকরে শ্রমিক ইউনিয়ন,মুসলিম লীগ ,ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এদের মধ্যে মতবিরোধ হয়। যুদ্ধের সময় কারখনাগুলোতে শ্রমিকেরা যাতে ধর্মঘট না করে সেজন্য সুধা , অমিত সমেত কম্যুনিস্টরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। তাদের লক্ষ্য ছিল জনযুদ্ধে ব্রিটিশ শাসকের কোনরকম অসুবিধা যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। ।গুজব রটেছিল-"কম্যুনিস্টরা বিলিতি কোম্পানিকে জব্দ করলে না, টাকা খেয়ে স্ট্রাইক মিটিয়ে দিলে।"[৪] কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস ধর্মঘট করে উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিকল করে ব্রিটিশকে দুর্বল ও বিপর্যস্ত করে ফেলতে চেয়েছিল, উপন্যাসে বর্ণিত একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য।

'উনপঞ্চাশী' শুরু হয়েছে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের উত্তেজক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে- "মহাত্মাজী গ্রেফতার, পণ্ডিত নেহেরু গ্রেফতার, মৌলানা আজাদ গ্রেফতার, বোম্বায়ে আগুন,দাঙ্গা। "[৫] গান্ধীজীর আন্দোলনকে মুসলিমলীগ সমর্থন করতে পারে নি , কেননা মুসলমানদের দাবী দাওয়াতে গান্ধীজী কর্ণপাত করেন নি । উপন্যাসে সাহেদুদ্দিন মনে করে মুম্বায়ে অখণ্ড হিন্দুস্তান প্রস্তাব নাকচ করে কংগ্রেসের দরকার ছিল লীগের সঙ্গে বোঝা পড়া করা । লীগের জাহিদুদ্দিন ও মনে করে, "আপনাদের স্বাধীনতা মানে অখণ্ড হিন্দুস্থান- আমাদের স্বাধীনতা মানে পাকিস্তান। আপনারা স্বাধীন হবেন মানে আমরা হব আপনাদের অধীন।"[৬] ১৯৪৬ সালে কোলকাতার বুকে হিন্দু-মুসলিমের

মধ্যে যে ভাতৃঘাতী রক্তক্ষয়ী ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছিল তার বীজ এখানেই নিহিত । জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি মুসলিমলীগ আস্থা স্থাপন করতে পারেনি, একে তারা হিন্দুদের স্বার্থরক্ষাকারী প্রতিস্থান বলেই মনে করেছিল। গোপাল হালদার এই বিষয়টাকেই উপন্যাসে নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে এভাবে তুলে এনেছেন।

গান্ধিজির 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' নীতি জনগনের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে কিন্তু অল্পকালের মধ্যে তাতে হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু হয়েছে, কিন্তু গান্ধীজী অহিংস নীতির প্রতি আস্থাশীল। বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে ও আমলাদের কাছে মুরারি সেন, ধরমবির মেহেরার কাছে ঘুরে ঘুরে বিনয় উপলব্ধি করেছে, এই আন্দলনে হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডে গান্ধীজীর কোনোরকম মত ছিল না। আন্দোলনের বিরোধিতা করায় সাধারণ মানুষের মনে হয়েছে, কম্যুনিস্টরা সাম্রাজ্য বাদীদের দালাল। ডাক্তার খাঁ গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে মুম্বাই গিয়েছিলেন , তিনি দেখেছেন – 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' – এর ডাকে বিক্ষুব্ধ জনতা উপন্যাসে ট্রাম পুড়িয়ে দিচ্ছে,লাইন উপরে ফেলছে,টেলিফোন ,টেলিগ্রাফ বন্ধ করছে জনতা। গান্ধী বাদী নেতা হরসুখ রায়ের মুখে গান্ধীর মনোভাব প্রকাশ করেছেন লেখক 'সত্যি মহাত্মাজী এসব চাইতেন না' ।মহাত্মাজিকে আগেই সরিয়ে দিয়ে আগুন ছড়াবার ব্যবস্থা যে গভর্নমেন্ট নিজেই করেছে, সেই প্রসঙ্গ 'স্বদেশী' মুরারি সেন ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের আলোচনার মাধ্যমে উঠে এসেছে। "তাই তো রক্ষা -মহাত্মাজিকে এবার আগেই সরিয়ে নিয়েছে। নইলে আগুন দেখেই উনি বলতেন, 'আমি উপোষ শুরু করলাম- অহিংসা হচ্ছে না।'"[৭]

গোপাল হালদার তাঁর উপন্যাসে জাপানী বিমানহানা ও সাধারণ মানুষের আতঙ্কের প্রসঙ্গ এনেছেন। জ্যোৎস্নাস্নাত রাত্রে অপ্রত্যাশিত সাইরেনের সব্দে মানুষের অসহায়তা, ত্রস্ততা, স্তব্ধতা ও প্রানে বাঁচার প্রাণপণ প্রয়াস; আবার কিছুক্ষণ পরে অল ক্লিয়ারের শব্দে মানুষের সম্বিৎ ফিরে পাওয়া, আবার নিয়মিত জীবনারম্ভ লেখক সার্থক ভাবেই দেখিয়েছেন । বর্মায় বিনয় এই শব্দ শুনেছে, শুনেছে সোনাপুরে, কোলকাতায়; দেখেছে সভ্যতার অভিশাপস্বরূপ এই যুদ্ধও জিঘাংসার রাজনীতি।

কোলকাতা শহরের লোক ভয়ভীতও শঙ্কিত হয়ে পালাতে শুরু করেছে , কলকারখানার শ্রমিকদের মধ্যে মালিকের কাছে বাঁচার নানা দাবী , আত্মরক্ষার জন্য শেল্টারের দাবী প্রবল হয়েছে। বিনয় দেখেছে, মানুষ চলেছে সারি সারি ; তার স্মৃতিপটে ভেসে উঠেছে রেঙ্গুন-বর্মার পথের বিভীষিকা- "কোলকাতা ছেড়ে চলেছে সবাই। তার দরিদ্রতম শহরবাসীরা চলেছে কলকাতা ছেড়ে। হেঁটে ছোটো খাটো পোঁটলা নিয়ে চলেছে স্বামী, চলেছে স্ত্রী, চলেছে পুত্রকন্যা। দুঃস্থ ,রুগ্ন, ত্রস্ত,-সবাই চলেছে। ...স্ত্রীর কক্ষে সন্তান , হাতে ধরা সন্তান, মাথায় হয়তো ওদের পিতলের বা এনামেলের হাঁড়িকুড়ি, চলেছে দলে দলে । ...বাস ছুটেছে , উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে, প্রাণপণে ছুটেছে। অভিশপ্ত শহরের প্রান্তে মানুষের বোঝা নিক্ষেপ করতে হবে। ট্রাম চলেছে অপেক্ষাকৃত মন্দগতি-দূরে যেতে হবে, ঘুরে যেতে হবে। বিষণ্ন, শ্রান্ত, রাতজাগা, নিষ্প্রভ নরনারী তার কোটরে। ট্রামেও চলেছে মানুষ । ... তারা হাওড়ায় পৌঁছুবে । তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে চায় তারা।- দেরি করবে না। তারা শহর ছেড়ে চলেছে। "[৮]

উপন্যাসে দেখাযাচ্ছে যুদ্ধও মন্বন্তরের পটে দুটি বিপরীতমুখী মানুষের স্রোত তৈরী হয়েছে। একটি, ব্রিটিশ উপনিবেশ কোলকাতায় জাপানী বোমার ভয়ে ভাবনায় ব্যস্ত মানুষের শহর ত্যাগ করে গ্রামে পালায়ন , অন্যটি ভিটে মাটি হারিয়ে খাদ্যের সন্ধানে শহরে আগমন।

যুদ্ধের বাজারে বিনয় দেখেছে মুনাফার মৃগয়া চলছে দেশ জুড়ে, যেন নেমেছে টাকার জোয়ার । মুরারি সেন, সচিপ্রসাদ, মেহেরা প্রভৃতিরা মুনাফার মৃগয়ায় মেতে গেছে। শিক্ষিতরা কেউ বেকার নেই,কন্ট্রাক্ট, দালালি ইত্যাদি পেষায় নিযুক্ত হয়েছে। বাঙালি মহাজনেরা পাঞ্জাব ও মুম্বায়ের মারোয়াড়ীদের থেকে পিছিয়ে পড়েছে এবং নিজেদেরকে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড় করাবার জন্য মরিয়া হয়েছে। মুরারি সেন, সচিপ্রসাদ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে নিজেদের ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলেছে। "আজ ভারতীয় ইন্ডাস্ট্রির বাড়বার দিন , বিলিতি ইন্ডাস্ট্রির

গুটানোর দিন।" মুরারির ব্যাংক টাকায় ফেঁপে উঠেছে, বিরু ব্যবসা করছে, জাহেদুদ্দিন দালালি করছে, ইদ্রিসের উন্নতির স্তর গুলো – প্রথমে 'ইদ্রিস কন্টগদার,' 'ইদ্রিস মিয়া কন্টগদার','ইদ্রিস আহমেদ ,আরমি কন্ট্রাক্টর', আজ সে 'জেলার নতুন ধনিদের মধ্যে সেরা ধনী'। 'টাকার জোয়ার চলেছে! টাকার জোয়ারে দেশই চাপা পড়ল। চারিদিকেই খালি টাকা, কিন্তু মানুষের দুর্দশার অন্ত নেই, সবার সেই এক কথা-"ধান নেই। চাল নেই ,তেল,নেই, নুন নেই, কাপড় নেই, কয়লা নেই, কাগজ পর্যন্ত নেই। "

একদিকে যুদ্ধের পরিস্থিতি এবং তার সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই দুইয়ের মেলবন্ধনই বাঙলাকে মন্বন্তরের অবশ্যম্ভাবী পরিনতির দিকে নিয়ে গিয়েছিল। তবে লেখক মানুষকেই মূল অভিযুক্তর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। মন্বন্তর নিবারণের জন্য সরকারের চেষ্টার ত্রুটিও উদাসীনতা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতবিরোধ, প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম লঙ্গরখানা স্থাপন,মন্বন্তরগ্রস্ত মানুষের গ্রাম ছেড়ে শহরে আগমন,শহরের রাস্তায় তাদের করুণ পরিনতির দৃশ্য, মহামারীর প্রকোপে ভয়ঙ্কর মৃত্যুর দৃশ্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ লেখক তাঁর উপন্যাসে ঘটনাক্রমের নিরিখে বাস্তবনিষ্ঠভাবেই উদ্ঘাটিত করেছেন-

(ক) যুদ্ধের সময়ে জাপানী আক্রমনের সম্ভাব্য জায়গা থেকে চাল সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করে ব্রিটিশ সরকার। এজন্য দিল্লি গভর্নমেন্ট বেঙ্গল সরকারকে হুকুম জারি করেছে। "বাঙলার বাড়তি চাল কিনে ফেলতে হবে। ...দিল্লির ঢালা হুকুম –বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এজন্য যা টাকা চায় তা'ই পাবে, কিন্তু কাজটা সারতে হবে তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি" [১০] এজন্য বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ভালো কমিশনে এজেন্ট নিযুক্ত করেছে। মুম্বাইয়ের 'ইব্রাহিমভাই এন্ড কোং' তবে কন্ট্রাক্টর দেওয়ার ব্যাপারে মন্ত্রিদের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ রয়েছে। এই কোম্পানির দালাল কে হবে তা নিয়ে খুব প্রতিদ্বন্দিতা চলে, লীগের এম এল এ জাহেদ লীগের সেক্রেটারী হাফেজের মধ্যে। হাফেজই পায় দালালি। দালালদের মারফৎ চালের হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে মূল্য বেড়ে গিয়েছে। এক তালহারা ছন্দহারা ঊনপঞ্জাশী ঘিরে ধরেছে দেশকে -দেশের মানুষকে , এমন সময় বিনয় সীতার চিঠির ডাকে সোনাপুরে এসে দেখেছে, পৌষের ফসল এবার তেমন ভালো হয়নি। চরের ধান কিনছে এব্রাহিম ভাইরা। জিনিসপত্রর দাম হু হু করে বেড়ে গিয়েছে।

(খ) ইনফ্লেশান, অর্থাৎ যুদ্ধের বাজারে সরকার প্রচুর কাগজের নোট ছাপিয়ে বাজারে ছেড়েছে দেশি চাল লুটতে । টাকার দাম কমেছে , জিনিসের দাম উত্তরোত্তর বেড়েছে। এভাবে দেশীয় অর্থনীতির ফাঁকির দিকগুলো দেখিয়েছেন লেখক । মিস্টার সেন বলেন –"বিনি পয়সায় এদিকে আমাদের মাল যাচ্ছে বিদেশে ...আমরা পাচ্ছি কাগজ, নোট আর নোট । ... জিনিস চাই, কাজ চাই ? ছাপাও নোট"[১১]

(গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান কর্তৃক আক্রান্ত বর্মা প্রদেশ থেকে প্রচুর শরণার্থী বাঙলায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের খাদ্যের জন্য সরকারের তরফ থেকে কোন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। উপরন্ত বর্মা , সিলেট ও অনান্য প্রদেশ থেকে যে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য বাঙলায় আমদানি হোত, তা বন্ধ হয়েছে। তাছাড়া দুর্ভিক্ষের দিনে নৌকা নাই, রেল নাই, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, আবার হুকুম করে চাল আমদানি বন্ধ করেছে ব্রিটিশ সরকার।

(ঘ) বিশ্বযুদ্ধকালীন ব্রিটিশের 'পোড়ামাটি নীতি' দুর্ভিক্ষকে ত্বরান্বিত করেছিল। জাপানীরা পূর্ব সীমান্ত দিয়ে ভারতে পৌঁছালে যাতে খাদ্য সামগ্রী না পায় সেজন্য ফসল নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। কৃষকদের ঘর থেকে খাদ্যদ্রব্য সরকার আগেই কিনে নিয়েছিল অধিক মূল্যে । মুদ্রাস্ফীতির অর্থ না বুঝে সাধারণ মানুষ প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে বেশি মুল্যে চাল বিক্রি করে দিয়েছে- "সমস্ত ধান চাল বিক্রি করে দিয়েছে চাষি গৃহস্থেরা । নিজেদের এর পরে কি হবে ভাবেনি দুর্ভাগারা ।ভাবলে সারে এগার টাকা মন চাল বাপের জন্মে ও শোনেনি কেউ। যা পেলাম খুব জিতলাম"[১২]

(ঙ) আউসের ফসল নষ্টও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তুফান ও বন্যায় ।'তেরশ পঞ্চাশে'র শেষে দেখি আউস ধানের দিন এসে যাচ্ছে, কোথাও কোথাও তা কাটা হচ্ছে – প্রথম কার ফসল। তখনি এল দামোদরের বন্যা। এই প্লাবনে

মৃতপ্রায় বাংলার দশ লক্ষ বাঙালির ঘর দুয়ার ক্ষেত ডুবিয়ে দিয়েছে। দু কটি বাঙালির প্রাণরক্ষার পথ দিয়েছে উরিয়ে চুরমার করে। "বাঁধ ভেঙে দামোদরের জল ভাসিয়ে নিয়ে গেল পশ্চিমবাংলার শস্যভরা ক্ষেত , ঘর-দুয়ার, বাড়ি -ঘর । পাঁচ লক্ষ একর জমি হয়ে গেল শূন্য। "[১৩]

(চ) বিনয় দেখেছে জোতদার, মহাজন, সরকারী এজেন্টদের ঘরে চালের পাহাড় জমেছে। কিন্তু সেই চাল অগ্নিমুল্যের বাজারে সাধারনের করায়ত্ত হয়নি। "ইব্রাহিম ভাইয়ের গুদামে চাল জমেছে লাখ লাখ মণ , এতদিন শিলেটের চাল এসেছে,এ দিকের চাল এর পরে যাবে । সব চাল জাহাজ ভর্তি কলকাতা যাবে বিদেশের জন্য। তা ছাড়া ,এই শিলেটের ওদিকের চালই আবার ইব্রাহিম ভাইয়ের থেকে কিনছে কাছারের চাবাগানওয়ালারা।শিলেটের ওদিক থেকে নৌকায় আসে সূর্য্যিপুর সেখান থেকে যায় গোয়ালন্দ ,কোলকাতায়, আবার পরে ফেরত যায় কাছারে আসেমে। সেই শিলেটেরই চাল । এই চলছে মজা। "[১৪] অধিক মুনাফা দিয়ে সরকার চাল কিনে নিচ্ছে যুদ্ধের সৈনিকদের রসদ হিসাবে। তাছাড়া কিনছে এরোড্রমের ঠিকাদাররা , মিলিটারির কনট্রাক্টররা। খাদ্যশস্য অগ্নিমূল্য হয়েছে, সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার সীমার বাইরে চলে গেছে চাল। দুর্ভিক্ষের মনুষ্য সৃষ্ট কৃত্রিম কারণ গুলোকে সচেতন ভাবেই গোপাল হালদার উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন।

(ছ) দেশের দুর্ভিক্ষে লীগ সরকারের উদাসীনতার দিকে লেখক অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে নির্বাচনে পদপার্থীর ব্যাপারে তাঁরা পরস্পরের মধ্যে কলহে লিপ্ত। দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধের জন্য কোনোরূপ তৎপরতার পরিচয় তাঁরা দেননি। অথচ, বিপর্যয়ের চরম মুহূর্তে বক্তৃতার ফোয়ারা ছুটিয়ে দেন তাঁরা, মন্ত্রীরা বলেছেন —"চালের আসলে অভাব নেই। দেশের লোকেরও ভয়ের কোন কারণ নেই।"[১৫] সুরাহবরদি বললেন- "তিনি ভারত সরকার থেকে আর ও ধান ও চাল আনাচ্ছেন। চোদ্দ লক্ষ মণ চাল আসছে, ষোল লক্ষ মণ অন্য খাদ্যশস্য ও তাঁরা পাবেন"[১৬] মন্ত্রী সভার দুষ্কৃতি উদ্ঘাটিত করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন- "ইস্পাহানির তাবেদার তাঁরা ,কোটি কোটি টাকা নিয়ে ইস্পাহানিকে ছিনিমিনি খেলতে দিয়েছেন কেন মন্ত্রীরা? ...। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' ঐতিহাসিক প্রমাণ ডক্টর মুখাজীর হাতে- তিনি তা শুনিয়ে দিচ্ছেন।"[১৭]

'তেরশ পঞ্চাশ'-এ লেখক বিবরণ দিয়েছেন পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়াবহ মৃত্যুর বিভীষিকা, বাঁচার জন্য মানুষের আপ্রাণ চেষ্টা। আত্মহত্যার খবর এখন পুরোনো,আসছে অনাহারে মৃত্যুর খবর; সোনাকান্দি, সর্ষেখালি, সল্লাখালি, হাকিমহাকা, মেহেরপুরে মানুষের খাদ্যাভাবে কচু, গাছের পাতা, ফল-মূল,তাই দিয়ে উদর ভর্তি করার দৃশ্য বিনয় দেখেছে। আবার তাও যখন শেষ হল তখন ক্ষুধায়, শীর্ণ-বিশীর্ণ,নিস্প্রভ, অস্থিচর্মসার দেহের মানুষদের শহরে পাড়ি জমালো । কোলকাতা আবার প্রত্যাবৃত্ত লকজনে ভরে উঠেছে। কোলকাতার রাস্তায় ঘরবাড়ি ছাড়া অজস্র নরনারী 'জীবন্ত মানুষের সহস্র সহস্র মৃত আত্মার ন্যায়' ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষ নেই তারা আর , সোনাপুরের মতোই কঙ্কালের সার; তেমনি ক্লান্ত-ক্লিষ্ট-অন্নহীন ও প্রাই বস্ত্রহীনও। পথের দুপাশে জীবন ধুঁকছে । তাদের কোলাহলে পূর্ণ শহরের বাতাস। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে তাদের চাওয়া- 'মা ভাত ,মা ভাত', তারপর 'মা দুটি ফ্যান ভাত- ফ্যান ভাত', এখন আবার 'মা ফ্যান, মা ফ্যান ,মা ফ্যান'।

প্রমথ, শিবু,মজিদ প্রভৃতি কম্যুনিস্ট কর্মীরা ভুখামিছিল বের করেছে। দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধে খাদ্য সমিতি গড়েছে, গ্রামে গ্রামে ঘুরে খাদ্য সম্মেলন ডেকেছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টায় তারা কংগ্রেস, লীগ, হিন্দু মহাসভাকে সমানভাবে পায়নি। পার্টিগত আদর্শ ও বক্তিগত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তারা পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত থেকেছে। বিনয় কম্যুনিস্ট কর্মীদের কর্মনিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়েছে, কিন্তু তাদের নীতিকে সর্বাংশে সমর্থন করতে পারেনি। খাদ্য কমিটি, পিপলস রিলিফ কমিটির প্রয়োজনীয়তা বুঝেছে। লাউতলিতে কম্যুনিস্টদের বৃদ্ধা 'বাঈ আম্মার' সঙ্গে বিনয়ের পরিচয় হয়েছে, তাঁর এক ছেলে খালেদ আজ 'ইনকেলাবের দলে, 'মজদুর রাজ' কায়েম করার উদ্দেশ্য নিয়ে সে 'মজদুর কিসানের মুলুকে লড়াইতে গেছে'। বাঈ আম্মার মুখ থেকে বিনয় শোনে এই সত্য- "দুনিয়ার লড়াই চলছে - গরীবকে মারছে, সবাই মিলে মারছে গরীবকে। তারা জমি চাষ করে,ফসল করে, খেতে পায়না

গরিবই তবু; মরবার বেলা আবার তাদেরই পড়ে প্রথম ডাক "[১৮] তবে তিনি নিজের স্থির বিশ্বাসে অটল। "আর জিতব ও আমরাই। ইমান আমাদের সাফ -আমরাই জিতব। "[১৯] দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে কম্যুনিস্ট কর্মকাণ্ডে নিষ্ঠা ও সেবাব্রতের প্রতি একরকম শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে চরিত্রগুলোকে রূপায়িত করেছেন লেখক।

'তেরশ পঞ্চাশ'এর নতুন বৎসরের প্রথম দিন, 'নতুন বৎসর বুঝি আজ -১৩৫০', অভ্যর্থনা ক্ষুধা-দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধের দ্বিবিধ আয়োজনে। মহানগরী কোলকাতার রাস্তায় নিরন্ন মানুষের ভিড়, মায়েদের শুষ্ক বুকে সুস্ককণ্ঠ শিশুদের ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার দৃশ্যে, 'মা ভাত, মা ভা্ মা ভাত' শব্দে ও সাইরেনের শব্দে। বিনয় দেখেছে, "দুপুরের পথে জল-কাদা, ঘোলা জলের যথেচ্ছ প্রবাহ, তরকারির খোসা -চারিদিকে ডাস্টবিনের ছাপিয়ে-পরা আবর্জনা। তার চারিদিকে পাঁতি পাঁতি করে খুঁজছে মানুষ খাদ্য - বুড়ো ,ছেলে, নারী-পুরুষ -শ্মশানের প্রেতের মতো মূর্তি - খাদ্য খুঁজছে।"[২০] দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সরকারী বেসরকারি উদ্যোগে লঙ্গরখানা খোলা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। দলে দলে মানুষ চলেছে লঙ্গরখানার উদ্দশ্যে, তারা অসংখ্যা, হাতে তাদের ভাঙা থালা, মাটির পাত্র , টিনের কৌটো। নানা ভেজাল লঙ্গরখানার খিচুড়িতে, তা খেয়েও অনেকের মৃত্যু হচ্ছে। অনাহারে মৃত মানুষগুলোকে এ- আর- পির লোকেরা লরিতে নিয়ে যাচ্ছে পশুদের মতো করে।

১৩৫০ এর শেষের দিকে দেখি মহামারি আসছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত কঙ্কালসার দেহে টাইফয়েড ওকলেরার প্রকোপ দেখা দিচ্ছে, ম্যালেরিয়া বাড়ছে, চলছে বসন্ত, কুৎসিত রোগেও দেশ ছেয়ে যাচ্ছে। এদিকে কুইনাইন বাজার থেকে উধাও, দাম আকাশ ছোঁয়া। পয়সার বিনিময়ে কুইনাইন পাওয়া গেলেও তাতে ভেজাল, স্বাদ তেঁতো নয় , মিষ্টি। একদিকে দেশের মানুষের সেবার সুযোগ, অনদিকে সম্পদ আহরনের হাতছানিতে বিনয় ওষুধের কারখানা খুলেছে। সোনাপুরের কথা, সীতার অসুখ, প্রভাতবাবুর অসুখ ,আর ওষুধের অভাবে মারা গেল বিরুর দাদা। এই বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে ভগ্নীপতি সচিপ্রসাদের কর্মশক্তি ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সে কারখানা তৈরি করেছে। বিনয় বুঝেছে মহামারীর হাত থেকে মানুষের রক্ষা নেই, ওষুধের কারখানায় খাঁটি ওষুধ তৈরি হয়না, কেমিক্যাল, কয়লা ইত্যাদির অভাব। বিহারী সেনের স্ত্রী মরেছে খাদ্যের অভাবে নয়, ভেজাল খাদ্য খেয়ে। শিল্পপতি সচিপ্রসাদের একমাত্র কন্যা ইরার মৃত্যু হয়েছে তার মামা বিনয়ের ন্যাশান্যাল মেডিসিন কোম্পানির শক্তিহীন ও ভেজাল ওষুধ খেয়ে। লেখক দেখিয়েছেন মন্বন্তর বলি নেয় নিরন্নদের কাছ থেকে, কিন্তু মহামারী বলি নেয় অন্নপতিদের ঘর থেকেও।

উপন্যাসের প্রারম্ভেই কোলকাতায় অমিতের শয্যা পাশে বিনয় বলেছিল 'আমি পলিটিক্স চায় না'।সেই বিনয় ধীরে ধীরে দেশকে ভালোবেসে, দেশের মানুষকে ভালোবেসে জীবনের এক গভীর সত্যকে অনুভব করেছে; সে উপলব্ধি করেছে দেশ জুড়ে এক মুনাফার মৃগয়া চলছে, দয়া-মায়া-মমতা আর কিছু নাই । আর দেখতে দেখতে মুনাফার মৃগয়া হয়ে পড়েছে মানুষের মৃগয়া এ দেশে। যা কম্যুনিস্টদের মূল কথা , 'বীজমন্ত্র'। বিনয় বুঝেছে , সাধারণের পথই হল পলিটিক্সের পথ -"মানুষ এক সঙ্গে চলতে গেলেই সে চলা হয়ে ওঠে পলিটিক্স-চলতে চলতেই বিনয় বুঝল এ সত্য। আর পলিটিক্সকে তাই তখন থেকে মনে মনে অস্বীকার ও করতে পারল না। বিনয়ের জীবনে সে এক প্রকাণ্ড আবিষ্কার।"[২১]

শিল্পগুণে উপন্যাসটি তেমন উন্নতমানের হয় নি ঠিকই , কিন্তু তার মূল ঐতিহাসিক বাস্তবতার মাটিতে প্রোথিত। মন্বন্তরকে প্রেক্ষাপট রূপে ব্যবহার করে লেখা অনান্য ঔপন্যাসিকদের রচনার ভিড়ে গোপাল হালদারের মন্বন্তর ট্রিলজি স্বতন্ত্র মর্যাদার দাবী রাখে। কেননা এখানে লেখক উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাসের সত্যকে অবিকৃত রেখে মন্বন্তরের বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে লেখা সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি'। সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি'তে কংগ্রেসি মতাদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ আস্থা, কম্যুনিস্টদেরপ্রতি তিনি উদারতার পরিচয় দিতে পারেননি - নানা ঘটনা প্রসঙ্গে ব্যঙ্গচ্ছলে তিনি তাদেরকে নিন্দা করেছেন। কিন্তু গোপাল হালদার কম্যুনিস্ট হলেও কংগ্রেসের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধাবোধ রচনার নেপথ্যে প্রেরণা জুগিয়েছে। শাহিদুদ্দিনের প্রতি বিনয়ের শ্রদ্ধাবোধ

কংগ্রেস ম্যানদের প্রতি গোপাল হালদারের শ্রদ্ধাকেই মনে করিয়ে দেয়। অমিত বলে - "প্রথম দিন থেকে আমি কংগ্রেসের সভ্য। ...কিন্তু তবু বিপ্লবী প্রেরণাকে অস্বীকার করিনি । এ মাটির সেই প্রেরনারই পরিণতি আমরা। বিপ্লবী ঐতিহ্য তো মিথ্যা হয়নি , তাই আমরা আজ কম্যুনিস্ট- শ্রেষ্ঠ পরিচয় একালের বিপ্লবীর।"[২২] এখানেই অমিতের সঙ্গে তার স্রষ্টা লেখকের হুবহু মিল। দুজনেই কংগ্রেস ছেড়ে কম্যুনিস্ট হয়েছেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে গান্ধীজী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনএ গোপাল হালদার আকৃষ্ট হয়েছিলেন । কংগ্রেস দলের সদস্য হিসাবে ১৯২৩ সালে দিল্লিতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের কিছু নীতি কর্মসূচি ও যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তিনি দ্বিধা গ্রস্ত ছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি সুভাষ চন্দ্র বসুর সঙ্গে কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

"তবু শেষ পর্যন্ত আমি এই মন্বন্তরের কথাচিত্র লিখলাম এই জন্য যে, আমি এই সময়ে বাঙলায় জীবিত ছিলাম- আর দেখেছি ঘটনা ও মানুষকে; এই আমার সাক্ষ্য । যথাসাধ্য তাই আমি চেষ্টা করেছি এই সাক্ষ্যকে সত্য করতে। দেখেছি , প্রথমত, ঘটনা যেন বিকৃত হতে না পারে, মানে ইতিহাসের মর্যাদা থাকে।"[২৩] সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে নিছক পাঠকদের আনন্দদানের উদ্দেশে লাগামছাড়া কল্পনার অবকাশ ঘটিয়ে মনোজ্ঞ রসরচনার কোনরকম মানসিকতা বা আগ্রহ লেখকের ছিল না। সুধা-চিত্রা-সীতা প্রভৃতির সঙ্গে বিনয়ের সম্পর্ককে ঘিরে একটি জটিল প্রণয় সম্পর্কের আবর্ত তিনি অনায়াসেই সৃষ্টি করতে পারতেন। কিংবা রেণু - বেনু- বিরূর সম্পর্ককে ঘিরে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সুযোগ তাঁর ছিল। কিন্তু তিনি সেপথে অগ্রসর হন নি। ইতিহাসের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদে ঘটনা প্রবাহকে স্থান ছেড়ে দিয়েছেন পর্বের পর পর্বে, অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে। তাই উপন্যাসে মানুষের ভিড় বেড়েছে ঠিকই ,কিন্তু সকলকে ভালো করে দেখাবার ,তাদের অন্তরহস্য উদ্ঘাটন করার সুবর্ণ সুযোগ থাকলেও তা তিনি সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন। তাই রচনাশৈলী, শিল্পকৌশলের দিক থেকে খুব উৎকৃষ্ট মানের রচনা না হলে ও নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত এই ডকুমেন্টারি নভেল - 'মন্বন্তরের তিনপর্ব' ইতিহাসের একটি পর্বের বাস্তবনিষ্ঠ দলিলস্বরূপ ,আর এখানেই গোপাল হালদারের কৃতিত্ব ও তাঁর রচনার সার্থকতা।

তথ্যসূত্রঃ

১। হালদার, গোপাল, 'লেখকের কথা', 'মন্বন্তরের তিনপর্ব', প্রকাশ ভবন , কোলকাতা- ৭৩, প্রথম অখণ্ড প্রকাশ ভবন সংস্করণঃ জানুয়ারী- ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৫-৬ ।
২। ঐ, পৃষ্ঠা- ৬ ।
৩। ঐ, পৃষ্ঠা -২২২ ।
৪। ঐ, পৃষ্ঠা -১৩৭ ।
৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ২৪১ ।
৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৩৪ ।
৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ২৪৬ ।
৮। ঐ, পৃষ্ঠা - ৩৯৮ ।
৯। ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৫২ ।
১০। ঐ, পৃষ্ঠা- ১০১ ।
১১। ঐ, পৃষ্ঠা- ১০৪ ।
১২। ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৫৩ ।
১৩। ঐ, পৃষ্ঠা -৬১২ ।
১৪। ঐ, পৃষ্ঠা -৩৪৮ ।
১৫ ,১৬। ঐ, পৃষ্ঠা - ৫৬২ ।

১৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ৫১৩ ।
১৮,১৯। ঐ, পৃষ্ঠা-১৫৬ ।
২০। ঐ, পৃষ্ঠা -৬৪০ ।
২১। ঐ, পৃষ্ঠা -৪৫০ ।
২২। ঐ, পৃষ্ঠা ৭০৩-৭ ০৪ ।
২৩। ঐ, পৃষ্ঠা -৬ ।